স্নায়ুযুদ্ধঃ পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের দ্বন্দ্ব

ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয় স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে এর শুরু হয়েছিল এবং এর শেষ হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের পর। ১৯৯০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গেলে সে সময়কার আন্তর্জাতিক নেতৃবৃন্দ এবং নেতৃস্থানীয় সামরিক ব্যক্তিরা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে ছিলেন। তখন সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি তবে এক রকম যুদ্ধের মহড়া চলতে থাকে। রাষ্ট্র বিজ্ঞানের পরিভাষায় একে স্নায়ুযুদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়। রণাঙ্গনে কোন যুদ্ধ না হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ আরেকটি যুদ্ধ ঘটার আশঙ্কায় তটস্থ ছিল পুরো বিশ্বের মানুষ। এক অর্থে তখনকার তৎকালীন বিশ্ব দুটি পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে প্রায় দুভাগ হয়ে গিয়েছিল ।এ বিভাজনের মূলমন্ত্র হিসেবে মনে করা যেতে পারে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদী শিবিরের নেতৃত্বে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলোর নেতৃত্ব দিত সোভিয়েত ইউনিয়ন। তাদের অনুসরণকারী দেশগুলোর মধ্যে এই দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে পড়েছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন বিশ্বের নানা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপ শুরু করে। এই একই পথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও পা বাড়ালে ভয়াবহ এক যুদ্ধ পরিস্থিতির দিকে এগিয়ে যায় বিশ্ব।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ **পাঠ-৭.১** **স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা**
- ✓ **পাঠ-৭.২** **স্নায়ুযুদ্ধের উৎস**
- ✓ **পাঠ-৭.৩** **স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব**
- ✓ **পাঠ-৭.৪** **স্নায়ুযুদ্ধকালিন বিশ্ব পরিস্থিতি**
- ✓ **পাঠ-৭.৫** **স্নায়ুযুদ্ধের অবসান**

পাঠ-৭.১ স্নায়ুযুদ্ধের ধারণা

আভিধানিকভাবে ধরতে গেলে স্নায়ুযুদ্ধ কথাটির উদ্ভব আজ থেকে অনেক দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৩ এপ্রিল। কূটনৈতিক ব্যক্তিত্ব বার্নাড বালুচ কলম্বিয়ার এক ভাষণে সর্বপ্রথমে প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছিলেন বলে জানা যায়। তিনি তার ভাষণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যকার সম্পর্কের ব্যাপারে কথা বলেন। তিনি সেখানে উল্লেখ করেন পুরো বিশ্বের মানুষ এখন আর প্রতারিত হতে চায় না তারা এক ভয়াবহ স্নায়ুযুদ্ধের মধ্যে আছে। তবে তিনি স্নায়ুযুদ্ধ বলতে কোন যুদ্ধাবস্থা বোঝাননি। এক্ষেত্রে ব্যাপারটা অনেকটা এমন যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে, কিন্তু কোথাও কোন যুদ্ধ হচ্ছে না কিংবা রক্তপাত ঘটছে না।

স্নায়ুযুদ্ধ এমন একটি কৌশল যেখানে বিবাদমান পক্ষগুলো ভয়াবহ স্নায়বিক উত্তেজনার মধ্যে থাকবে একে অন্যের উপর চাপ বৃদ্ধি করতে থাকবে কিন্তু সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি নেবে না। এক্ষেত্রে কোন দেশ সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি না নিলেও এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি করে রাখবে যা যুদ্ধ পরবর্তী কিংবা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের চেয়েও ভয়াবহ পরিস্থিতির জন্ম দেবে। সরাসরি যুদ্ধের ঝুঁকি না থাকলেও এক্ষেত্রে এমন একটি যুদ্ধের আবহ তৈরি হবে যা এক অর্থে যুদ্ধ নয়, শান্তিও নয়।

বিভিন্ন জাতি রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের উত্থান পতন টানাপোড়েন এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিক্ততা কিংবা মতবিরোধ এ যুদ্ধকে প্রণোদিত করে। সম্পর্কের তিক্ততা, উত্তেজনা নিরসনে সরাসরি অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বিরোধ নিষ্পত্তির চেষ্টা চালানো হলে তাকে আমরা সরাসরি যুদ্ধ বলি। কিন্তু ছায়া যুদ্ধের ক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে-বিবদমান প্রত্যেকটি পক্ষ যুদ্ধ শুরু করতে চায়, কিন্তু করে না। তারা প্রত্যেকেই যুদ্ধের মহড়া দিতে থাকে কিন্তু সরাসরি রণাঙ্গনে নাম আর ঝুঁকি নিতে চায় না। সশস্ত্র সংঘাতের ভয়ে প্রত্যেকে তটস্থ থাকলেও রণসমাবেশ এবং অস্ত্রের সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে কেউ কার্পণ্য করেনি। ফলে যুদ্ধ না হলেও এক ধরনের যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে যা বিশ্ব শান্তির জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। বিবদমান শক্তিশালী দুটি রাষ্ট্রের যুদ্ধবাজ মনোবৃত্তি এক অর্থে বিশ্ববাসীর শান্তি বিনষ্টের ক্ষেত্রে যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়। পুরো পরিস্থিতি শান্তিপূর্ণ না হলেও অনভিপ্রেত অর্থ একে এক ধরনের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বলা যেতেই পারে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় দুটি বিবাদমান পক্ষ ছিল তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্র। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর নেতৃত্বে থাকা যুক্তরাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর নেতৃস্থানীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি এক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিল। এ দ্বন্দ্বের নিরসনে কোন ধরনের সামরিক হস্তক্ষেপ তখন দেখা যায়নি তবে সর্বক্ষণ এক রকম রণাঙ্গনের পরিবেশ বিরাজ করেছে বিশ্বজুড়ে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সামরিক এবং অর্থনৈতিক জোট গঠনের মাধ্যমে একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মহড়া দিতে থাকে তবে বিশ্বের বেশিরভাগ রণাঙ্গন তখন ছিল শান্ত। রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে পরাশক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশের মানসিকতা এবং শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের নিরন্তর চেষ্টা তাদের সামরিক মহড়ার পরিমাণ বাড়িয়ে দিলেও একে অন্যের উপর আক্রমণের সাহস করেনি। ফলে রণাঙ্গনে যুদ্ধ না হলেও আদর্শগত এবং মতাদর্শিক ক্ষেত্রে সংঘাত চলতে থাকে যা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বব্যাপী। এর ফলে সৃষ্ট উত্তেজনা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই নিয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ হিসেবে।

বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রাংকেল মনে করেন, গণতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা এবং সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রচেষ্টার যে দ্বন্দ্ব তার ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর সমন্বয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল স্নায়ুযুদ্ধ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ফ্রিডম্যান মনে করেন স্নায়ুযুদ্ধ যুদ্ধের একটি নতুন কৌশল যেখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করলেও রণাঙ্গনে কোন সংঘাত ঘটে না। এ দুটি ধারণা থেকে বলা যায় যে, সম্মুখ যুদ্ধকে এড়িয়ে বিরোধপূর্ণ পরিবেশে কূটনৈতিক সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় স্যার যুদ্ধের আরেক রূপ হল স্নায়ুযুদ্ধ। এই যুদ্ধকে আরেক অর্থে যুদ্ধহীন যুদ্ধ বলা যায়, যেখানে শত্রুভাবাপন্ন রাষ্ট্রগুলো পরস্পরের উপর চাপ প্রয়োগ করলেও সরাসরি আক্রমণে অংশ নেয় না।

পাঠ-৭.২ স্নায়ুযুদ্ধের উৎস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে শত্রুভাবাপন্নতার শুরু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকেই। ১৯১৭ সালের অক্টোবরে ভ্লাদিমির লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা রুশ জারের পতন ঘটায় এবং তৎপরবর্তী কমিউনিস্ট রাশিয়া বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়। ১৯১৮ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জাপান রাশিয়াতে সামরিক অভিযান চালায়। তারা যুদ্ধ হতে রাশিয়ার সরে যাওয়ার ফলে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জার্মানির পূর্ব দিকে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল, তা পূরণের লক্ষ্যে এটা করেছিল বলে কারণ দর্শায়। কিন্তু লেনিনের সদ্যপ্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট সরকার এই পদক্ষেপকে আক্রমণ হিসেবে গণ্য করে। আসলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় শক্তিরা পুঁজিবাদ-বিরোধী প্রচার ও সাম্যবাদের আন্তর্জাতিকীকরণের তোড়জোড় শুরু করার জন্য নতুন এই রাশিয়ার প্রতি বিরূপ ছিল। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে রাশিয়া ও তার আশেপাশের অঞ্চল নিয়ে কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণের অধীনে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩ সালের আগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি দেয়নি। ১৯২৯ সালে স্তালিন ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার গভীর রাজনৈতিক অনৈক্য আরও অবনতির দিকে মোড় নিতে থাকে।

১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে স্তালিন জার্মানির একনায়ক হিটলারের সাথে একটি আগ্রাসন-বিরোধী সন্ধি চুক্তিতে সই করেছিলেন। এখানে দুই পক্ষ একে অপরকে আক্রমণ না করার শপথ নেয়। পাশাপাশি জার্মান ও সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের অন্তর্বর্তী অঞ্চলগুলি একে অপরের মধ্যে ভাগ করে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু হিটলার চুক্তি ভঙ্গ করে ১৯৪১ সালের জুন মাসে জার্মান সেনাবাহিনী সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করেছিলেন। এসময় যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েতদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। জার্মানদের বিরুদ্ধে তারা তিন পরাশক্তি মিলে মিত্রশক্তি তথা কোয়ালিশন গঠন করে। কিন্তু এই কোয়ালিশনের মিত্রদের মধ্যে পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের অভাব ছিল না। সোভিয়েত পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে তিন শক্তির মধ্যে সোভিয়েতরাই সবচেয়ে বেশি মূল্য দিয়েছে। ১৯৪৪ সালে জার্মানদের পরাজয় যখন অবধারিত, তখন যুদ্ধ-পরবর্তীকালে এই কোয়ালিশনের সদস্যদের সম্পর্ক কেমন হবে তা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৪৫ সালের মে মাসে নাৎসি জার্মানির পরাজয়ের আগেই পোল্যান্ডের ভবিষ্যতের প্রশ্নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মতদ্বৈততা প্রকাশ করে। স্তালিনের সেনারা ১৯৪৪ ও ১৯৪৫ সালে পোল্যান্ড থেকে জার্মানদের হটিয়ে দেয় এবং সেখানে একটি সাম্যবাদ-সমর্থক সরকার স্থাপন করে। স্তালিন বিশ্বাস করতেন যে তাঁর দেশের নিরাপত্তার জন্য পোল্যান্ডের সোভিয়েত বলয়াধীন থাকা জরুরি। কিন্তু মিত্রশক্তিরা এর বিরোধিতা করে, এবং পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়েও এই একই দ্বন্দ্বের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই বলা যায়, ১৯৪৪ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপের নিয়তি নিয়ে দ্বন্দ্বই স্নায়ুযুদ্ধের বীজ বপন করে। তবে এ সময় দুই পক্ষই আশা করছিল যে, এই মতানৈক্য কেটে যাবে এবং যে বন্ধুত্বপূর্ণ চেতনা নিয়ে তারা যুদ্ধের সময় একত্র হয়েছিল, তা রক্ষা করা যাবে।

পাঠ-৭.৩ স্নায়ুযুদ্ধের উদ্ভব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার আগে এবং তার কিছুদিন পরে ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া এবং চেকোস্লোভাকিয়ার নাম বলা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ধারণা ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইউরোপের সমস্ত দেশ আস্তে আস্তে সমাজতান্ত্রিক ধারার দিকে অগ্রসর হবে। ফলে দিনের পর দিন রাশিয়ার শক্তিমত্তা বৃদ্ধি পাবে। এ পরিস্থিতিতে তারা বিশ্বজুড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য বিস্তারের সমস্যা দেখতে পায়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সম্মিলিতভাবে প্রত্যক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ করে যে শক্তির পরীক্ষায় তাদের থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। নানা দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার ধারণা প্রচার করে তারা নানা ক্ষেত্রেই সফল হয়েছে।

বিশ্বের নানা স্থানে তাদের সফলতা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মনে একরকম পরাজিত হওয়ার ত্রাস তৈরি করে। বিশেষ করে তারা চিন্তা করতে থাকে পরিস্থিতি এমন বিরাজ করলে একটা পর্যায়ে এসে সোভিয়েত ইউনিয়নও জার্মানির মতো যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সফলতা যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের মনে যে ত্রাস সৃষ্টি করেছিল তার মূল কারণ ছিল ক্রমবর্ধমান এক আধিপত্যবাদ। তারা চিন্তা করেছিল, এভাবে চলতে থাকলে এক পর্যায়ে বিশ্বের সব দেশের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য নিশ্চিত হবে। নানা দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য বিস্তার ঘটলে বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের কর্তৃত্বহীন হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্য সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার সাহস দেখায়নি। তবে তারা নানা দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর চাপ প্রয়োগ প্রয়োগ করতে থাকে। এ চাপের ফলে এক রকম সামরিক সাম্যবস্থার জন্ম নেয়, যা কোন বর্ধমান শক্তিমত্তার অধিকারী সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা পরাক্রান্ত যুদ্ধবাজ দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

সূচনাপর্বে কোন শক্তি সে যুদ্ধকে প্রণোদিত করেছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। বিশ্লেষকগণ এ যুদ্ধের সূচনা পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের ভূমিকাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। তাদের হিসাবে ক্রমবর্ধমান শক্তির মহড়া বিশ্ববাসীকে এ যুদ্ধের দিকে ধাবিত করেছিল। কারো কারো ধারণা সোভিয়েত ইউনিয়নের কম সম্প্রসারণ বাদি ধারণা এ যুদ্ধের দিকে বিশ্ববাসীকে ধাবিত করে থাকতে পারে। বিশ্বের নানা দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারের যে প্রবণতা, সেখানে যুক্তরাষ্ট্র কিংবা যুক্তরাজ্য বাধা হয়ে না দাঁড়ালে তারা যুক্তরাজ্য বা যুক্তরাষ্ট্রকে দুর্বল ভাবতে পারে। তাদের ক্রমবর্ধমান শক্তির পরীক্ষায় বাঁধা হয়ে দাঁড়ানোর পর সেই যুক্তরাষ্ট্র স্নায়ুযুদ্ধের সূচনাপর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে ১৯৪৬ সালের ৫ মার্চ যুক্তরাজ্যের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের ফুলটন বক্তব্য অনেক গুরুত্বের সঙ্গে বিচার্য। ফুলটন বক্তৃতায় ১৯৮০ সালের দিকে চার্চিল উল্লেখ করেছিলেন, রাশিয়া একমাত্র শক্তি প্রয়োগ ব্যতীত আর কোন ভাষা বোঝে না। তাই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য রাশিয়ার উপর শক্তি প্রয়োগের বিকল্প নেই। বিশ্বের অন্য সব শক্তিশালী রাষ্ট্রের রাশিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের যে নীতি তা শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছিল স্নায়ুযুদ্ধে।

পাঠ-৭.৪ স্নায়ুযুদ্ধকালিন বিশ্ব পরিস্থিতি

স্নায়ুযুদ্ধ শুরুর সময় নিয়ে মতভেদ থাকলেও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা একটি বিষয় নিশ্চিত করেছেন তা হচ্ছে এটি হঠাৎ করে শুরু হয়নি কিংবা শেষ হয়ে যায়নি। মনে করা হয়, ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে এর বাস্তব রূপ সবার কাছে ধরা পড়ে। তবে অনেকের ধারণা ১৯৪৬ সালে ফুলটন বক্তৃতায় চার্চিলের মন্তব্য থেকে স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছিল। তবে কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাতকে চিহ্নিত করা যায় না। তার হিসাবে ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার সময় থেকেই মার্কিন-রাশিয়া বিরোধ ধীরে ধীরে সে যুদ্ধে রূপ নেয়। এই যুদ্ধ ঘটেছিল একটা মহড়ার মধ্য দিয়ে। সরাসরি যুদ্ধ শুরু না হলেও সর্বত্র তখন এক রকম যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করে।

যুদ্ধকালীন বিশ্ব পরিস্থিতি বোঝার জন্য এর দুটি পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা জরুরি। বিশেষ করে ১৯৪৫ সালের দিকে ছায়া যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে একে দুটি পর্বে ভাগ করা যায়। স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি প্রায় দুই দশক বজায় ছিল। এক্ষেত্রে একটি দশকে অপেক্ষাকৃত বেশি উত্তেজনা কাজ করেছে। অন্য একটি পর্বে এসে উত্তেজনা অনেকাংশে কমে যায়। সেখানে সামরিক জোট গঠন, পাল্টা সামরিক জোট সৃষ্টি, দুই বৃহৎ শক্তির প্রভাব বলয় সৃষ্টির প্রবনতার পাশাপাশি নানা দিক থেকে উত্তেজনা প্রকাশ পায়। বইয়ের ভাষায় একে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের' যুগ বলা হলেও প্রকৃত অর্থে কতটুকু শান্তি বিরাজ করছিল, সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। সামরিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে হঠাৎ শক্তিশালী হয়ে ওঠায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে এক অর্থে অশান্ত হয়ে পড়েছিল পুরো বিশ্ব।

প্রথম পর্যায়ে ইউরোপে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতাদর্শিক সমাজতান্ত্রিক শিবিরের উদ্ভব, ট্রুম্যান নীতি, মার্শাল পরিকল্পনা, বার্লিন সংকট, ওয়ারশ চুক্তি, ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, কিউবা সংকট প্রভৃতি বিষয়ে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এ পর্বের প্রাথমিক পর্যায়ে আমরা ট্রুম্যান তত্ত্বের পরিচয় পাই। পূর্ব ইউরোপের দেশ গুলোতে সাম্যবাদের প্রসার ঘটতে শুরু করলে গণতন্ত্রের পরিত্রাণকারী হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অবস্থান নিশ্চিত করে। তাদের রাজনীতির প্রচারে এটাই প্রাধান্য পেতে শুরু করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন পুরো বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা আরো প্রচার করে যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব না হলে বিশ্ব মানবতার মুক্তি সম্ভব নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণবাদে ভয় পেয়ে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৭ সালে যে তথ্য প্রকাশ করেন, সেটা ইতিহাসে বিখ্যাত হয়েছে 'ট্রুম্যান তত্ত্ব' নামে। এই তত্ত্বের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ছিল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ও জাতীয় ঐক্য রক্ষার নামে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে হস্তক্ষেপের অজুহাত প্রতিহত করা। পাশাপাশি ট্রুম্যান তত্ত্বের আলোকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেভাবে হস্তক্ষেপ করছিল তার প্রতিরোধেও একটি কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চালানো হয়।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে ব্রিটেন গ্রিস থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিলে তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিস-তুরস্ক সংকটে হস্তক্ষেপের সুযোগ পায়। গ্রিসে তখন সম্মিলিত তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রিসের জাতীয় ঐক্য রক্ষার নামে সেখানে সামরিক হস্তক্ষেপ করে যে সাফল্য পেয়েছিল তা স্নায়ু যুদ্ধকে তীব্র করে তোলে। ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব জর্জ মার্শাল ঘোষণা করেন বাইরের সাহায্য না পেলে ইউরোপের ভেঙে পড়া অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার করা সম্ভব নয়। তখন ইউরোপীয়রা ধীরে ধীরে তাদের করণীয় ঠিক করতে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া দেশগুলো নানাভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের যাত্রা কঠিন করে দেয়।

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্রতর হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে কোনো ধরনের সহায়তা পেতে থাকে। তাদের যেকোনো রকম সংকটে এবং বিশেষ করে সোভিয়েত বিরোধী সংগ্রামে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সহায়তা করার যে প্রবণতা সেটাই মার্শাল পরিকল্পনা নামে ইতিহাস বিখ্যাত হয়েছে।

ইউরোপের নানা ব্যাপারে বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার উষ্ণ প্রতিক্রিয়া জানায়। ইউরোপের রাজনীতিক ব্যাপারে আমেরিকার সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকেও তাদের অভিমত জানিয়ে দেয়া হয়। তারা যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জানিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে যে, ইউরোপের অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে

তার ফলাফল ভালো হবে না। এর পরেও রাশিয়ার হুমকি উপেক্ষা করে ইউরোপের ১৬ টি কমিউনিস্ট বিরোধী দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। তারা নিজেদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়ার কথা ঘোষণা করে। এই দেশগুলোর মধ্যে অনেক দেশ আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে তাদের আর্থিক পরিস্থিতির উন্নয়ন ঘটায় বলে তাদের দেখে আরো অনেক দেশ অনুপ্রাণিত হয়। এ সময় রুশবিরোধী দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনকে ত্বরান্বিত করলেও স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনাকে নানা দিক থেকে উস্কে দিয়েছিল বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।

১৯৪৮ সালের দিকে এসে ইউরোপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে পরিচিতি চেকোস্লোভাকিয়া কমিউনিস্টদের দখলে চলে যায়। রাশিয়ার এ সাফল্যের ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্র যার পর নাই চিন্তিত হয়ে পড়ে। ঠিক এ বছরে সোভিয়েত রাশিয়া বার্লিন অবরোধ করে বসলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়। তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবরোধ থেকে বার্লিনবাসীকে বাঁচানোর জন্য আকাশ থেকে খাদ্য ফেলে সাহায্য করে আমেরিকা। এই অবরোধের মধ্য দিয়ে জার্মানির সঙ্গে রাশিয়ার বিরোধ সরাসরি যুদ্ধে রূপ নিতে থাকে। পক্ষান্তরে এমনি পরিস্থিতিতে ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল 'ন্যাটো' নামক একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটায় আমেরিকা। তবে মূলত আমেরিকার সোভিয়েত ভীতি থেকেই এই ন্যাটোর সৃষ্টি বলে বিশ্লেষকদের ধারণা।

অন্যদিকে ন্যাটোর বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রাশিয়াও এ সময় ওয়ারশ চুক্তি করেছিল। তখন এ চুক্তির মধ্য দিয়ে রাশিয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার হস্তক্ষেপ থেকে তার অধীনে থাকা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলোকে রক্ষা করা। বিশ্বের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শে অনুপ্রাণিত রাষ্ট্রগুলোর উপর আমেরিকার হস্তক্ষেপ যাতে না হয় সেজন্য ওয়ারশ চুক্তি কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে বলে বিশ্বাস করেছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই সংস্থা দুটি কার্যক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছিল সে ব্যাপারে বলা কঠিন। তবে এর মধ্য দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বৈরথ একটা নতুন মাত্রা লাভ করে।

১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের উদ্ভবের মধ্য দিয়ে স্নায়ুযুদ্ধ আরেক দিকে মোড় নেয়। তখন কমিউনিস্টদের প্রতি তীব্র ভয় এবং ক্ষোভ থেকে যুক্তরাষ্ট্র চীনের নতুন সরকারকে স্বাগত জানানোর মত সৌজন্য দেখাতে পারেনি। বরং তারা তাদের স্বাগত জানানো থেকে বিরত থাকে। ঠিক এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষ থেকে চীনের নতুন সরকারকে স্বাগত জানানো হলে তাদের মিত্রতা স্নায়ুযুদ্ধকালীন উত্তেজনা আরেক ধাপ বাড়িয়ে দেয়। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোরিয়ার গুরুত্ব বাড়তে থাকলে এশিয়ায় এসে স্নায়ুযুদ্ধ নতুন রূপ নেয়। ১৯০২ সালের দিকে একটি সম্মেলনে স্থির করা হয়েছিল কোরিয়া বিদেশী নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন জাপানের কাছ থেকে কোরিয়া কেড়ে নেয়। এ সময় যুক্তরাষ্ট্র সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কোরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করলে পরিস্থিতি নতুন দিকে ধাবিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চার পরাশক্তি মিলে একটা পর্যায়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে কোরিয়ার উপর তারা চারজনই পৃথকভাবে কর্তৃত্ব করতে পারবে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ৩৮ ডিগ্রি অক্ষরেখা অনুযায়ী কোরিয়াকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়। এক্ষেত্রে দক্ষিণ অংশের উপর আমেরিকার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন এই অংশের নাম দেওয়া হয় দক্ষিণ কোরিয়া। পাশাপাশি উত্তর অংশের উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের যা ইতিহাসে পরিচিতি পায় উত্তর কোরিয়া নামে। দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি চীনের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার পক্ষে অনুকূল ছিল না। বিশেষ করে তাদের নতুন সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি না দেয়ায় তারা শুরু থেকেই যুক্তরাষ্ট্রকে নিজেদের শত্রু ভাবতে শুরু করে। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিত্রতা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শত্রুতার আগুনে ঘি ঢালে। পরবর্তীকালে পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শত্রু যুক্তরাষ্ট্র ধীরে ধীরে চীনের শত্রুতে পরিণত হয়। তাই এক পর্যায়ে এসে চীন কোরিয়ার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলে তিন বৃহৎ শক্তির ছায়াযুদ্ধ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয় এশিয়ার মানুষের। এক পর্যায়ে সে স্নায়ুযুদ্ধ সরাসরি যুদ্ধে রূপ পেলে আমেরিকা কোরিয়ায় এসে পরাজিত হয়। ১৯৫৩ সালে কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তির দ্বারা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের অবসান হলেও সেখানকার ছায়া যুদ্ধ এখনো শেষ হয়নি।

১৯৫৩ সালের দিকে রাশিয়ায় স্ট্যালিনের মৃত্যু হলে স্নায়ুযুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হতে শুরু করে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তখন ক্ষমতায় আসেন আইজেনহাওয়ার। তখন থেকে দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হয়। ১৯৫৪ সালে বার্লিন ও জেনেভা সম্মেলন নামের দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে জেনেভা সম্মেলনে আলোচনার মুখ্য বিষয়

ছিল মারণাস্ত্রের নির্বিচার উৎপাদন ও ব্যবহারের কোনো যৌক্তিকতা নেই। এর বাইরে উভয় দেশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। ১৯৫৪ সালের দিকে পরিস্থিতির বদল স্পষ্ট হয়ে ওঠে যেখানে আমেরিকার নেতৃত্বে গঠিত হয় আরেকটি সংগঠন। তখন মধ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষার সংগঠনগুলো এর সঙ্গে যুক্ত হয়। এ সময়ে স্নায়ু যুদ্ধের তীব্রতা হ্রাসের বদলে বৃদ্ধি পায় এবং প্রমাণ তত্ত্বের মত আইজেন হাওয়ার মধ্যপ্রাচ্যের গণতন্ত্র স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সব রকম সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। এ সময় এসে স্নায়ুযুদ্ধ তীব্র করতে শুধু আমেরিকা এককভাবে দায়ী নয়; ১৯৪৯ সালে জার্মানির দু'ভাগ হয়ে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে একভাগ জার্মান যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র যা পশ্চিম জার্মানি নামে পরিচিতি পায়। অন্যদিকে জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পূর্ব জার্মানি নামে পরিচিতি পায়। স্নায়ু যুদ্ধের ফলে অতীতের ক্ষতবিক্ষত জার্মানি আবার বিভক্ত হয়ে যায়।

দুই বৃহৎ শক্তি শীর্ষ নেতার অনুপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি হঠাৎ পাল্টাতে থাকে ১৯৬৪ সালের দিকে এসে। তখন প্রত্যেকের মনে ধারণা জন্মায় যে, পারমানবিক বোমা কারো জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। তখন উভয়পক্ষ ধীরে ধীরে বিবাদ অবসানের দিকে নজর দেয়। তাদের প্রত্যেকে অনুভব করতে থাকে যে ভাবে হোক বিবাদ মিটিয়ে ফেলা গেলে প্রত্যেকের মঙ্গল। এক্ষেত্রে যুদ্ধের মহড়া বাদ দিয়ে প্রত্যেকে চেষ্টা করে এক ধরনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশ তৈরি করার জন্য। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া স্ব স্ব অবস্থানে উপযুক্ত নীতি অনুসরণের দিকে অগ্রসর হলে বিশ্ব রাজনীতিতে ধীরে ধীরে শান্তি ফিরে আসে। তবে ছায়া যুদ্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। এর দ্বারা আন্তর্জাতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান হয়েছে এমন নয়। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্যবাদী প্রচেষ্টার বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা পুরো সময় অতিষ্ঠ করে রাখে বিশ্বকে।

পাঠ-৭.৫ স্নায়ুযুদ্ধের অবসান

প্রথমদিকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল বিশ্বের অন্যান্য সব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের থেকে অনন্য। পরবর্তীকালে বলতে গেলে বিশ্বের নানা স্থানে গড়ে ওঠা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো এক অর্থে সোভিয়েত ইউনিয়নকে অনুসরণ করতো। ধীরে ধীরে বিশ্বের অনেকগুলো দেশে ছড়িয়ে পড়ে এই আদর্শ। বিশ্বের নানা স্থানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাফল্য যুক্তরাষ্ট্রের মনে ত্রাসের সৃষ্টি করে। ফলে বিশ্বের নানা স্থানে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলায় সোচ্চার হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা প্রকাশের যে দ্বৈরথ তা ধীরে ধীরে এক পর্যায়ে এসে স্নায়ুযুদ্ধকে স্তিমিত করে তোলে। বিশেষ করে বিশ্বের নানা স্থানে কমিউনিজম প্রতিরোধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা সফল হয়। তারা রাশিয়ার আদর্শে অনুপ্রাণিত অনেকগুলো দেশে তাদের পছন্দের মানুষকে ক্ষমতায় বসাতে সক্ষম হয়। পরবর্তীকালে এসব রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে সমাজতান্ত্রিক মতবাদ থেকে সরে আসে। পরে যুক্তরাষ্ট্রের বিজয় এবং রাশিয়ার পরাজয় নিশ্চিত করতে সোচ্চার হয় বিশ্বের অনকেগুলো দেশ। বলতে গেলে তাদের পরস্পর দ্বৈরথ এক পর্যায়ে স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

স্নায়ুযুদ্ধ বন্ধের কারণগুলো পর্যালোচনা করতে গেলে সবার আগে আমলে নিতে হবে অস্ত্রের মহড়া বন্ধের মানসিকতাকে। এক্ষেত্রে রাশিয়া কিংবা আমেরিকার প্রত্যেকে বুঝতে সক্ষম হয় যে বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার কিংবা নিরাপত্তার ঝুঁকি নিরসনের দুশ্চিন্তা তাদের সমস্যা সমাধানে যথেষ্ঠ নয়। দীর্ঘ যুদ্ধের ডামাডোলে দুই একবারের জয় তাদের জন্য শান্তি আনতে পারবে না এটা দেরিতে হলেও তারা বুঝতে পেরেছিল। ফলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্পরিক সন্দেহ অবিশ্বাস দূর করে সরাসরি চুক্তির চেষ্টা চালায় যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। স্নায়ুযুদ্ধ সৃষ্টিতে যেমন কতগুলো জোটের ভূমিকা ছিল তেমনি এর অবসানের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জোটের ভূমিকাকে অস্বীকার করার সুযোগ নেই। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন বা ন্যাটো এর ভূমিকাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তবে এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যুদ্ধের মহড়া বন্ধের চেষ্টা। তারা এই যুদ্ধের মহড়া থেকে নিজেদের সরিয়ে নিতে পেরেছিল বলে স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। বিশেষত, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিরোধী রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রয়োজন সামনে রেখে আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো আমেরিকা থেকে সাহায্য নেয়ার মাধ্যমে সরাসরি তাদের বিরোধিতা করে বসে। অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের অপরাধে তাদের দমন করতে পারেনি। ফলে এক পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে পড়ে স্নায়ুযুদ্ধের মহড়া।

সারাংশ

রাশিয়া এবং আমেরিকায় দুই শক্তির দ্বৈরথ শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করে স্নায়ুযুদ্ধ হিসেবে। এক অর্থে ধরতে গেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালের রাজনীতি এবং এ স্নায়ুযুদ্ধ অনেকটাই সমর্থক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পাশাপাশি তাদের সমর্থনপুষ্ট রাষ্ট্রগুলোর রাজনীতি একার্থে আবর্তিত হয়েছিল এই স্নায়ুযুদ্ধকে কেন্দ্র করেই। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্র ক্ষমতার উত্থান-পতন রাজনীতির রূপান্তর ও পরিবর্তন থেকে জন্ম নেয় বিভিন্ন দেশের মধ্যে সন্দেহ, উত্তেজনা এবং সম্পর্কের টানাপোড়েন। এই সম্পর্কের শীতলতা এক অর্থে নির্ধারিত হয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকার প্রত্যক্ষ সমর্থন কিংবা অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে ১৯৯০ সালের দিকে স্নায়ু যুদ্ধের উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হলেও তা এক অর্থে বিলুপ্ত হয়নি। সম্প্রতি সিরিয়া সংকট নিয়ে নতুন করে যে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে তাকে স্নায়ুযুদ্ধের নতুন রূপ বলে মনে করছেন অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক। তবে আভিধানিক অর্থে স্নায়ুযুদ্ধ বলতে যা বোঝায় তার নিরসন ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মধ্য দিয়ে।